রামকৃষ্ণায়ণ

ধ্যানমঙ্গলম্

স্বামী চেতনানন্দ

এ-জগতে মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষী। আমি ঠাকুরঘরে বা মন্দিরে চোখবুজে ধ্যান করলে কী ফল পাব? একবার মাদ্রাজে এক সাধু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেন, ''মহারাজ, জপধ্যান করছি, কিন্তু ফল তো পাচ্ছি না।'' মহারাজ চুপ করে শুনে কিছুই বললেন না। পরে সন্ধ্যায় ওই সাধুটি মন্দিরে ধ্যান করতে গেলে, মহারাজ তাঁর সেবককে বললেন, ''এই আপেলটা ঐ সাধুর সামনে রেখে আয়।'' তারপর সাধুটি মহারাজকে দেখতে এলে, তিনি বললেন, ''কী, ফল পেয়েছ তো?''

আমরা ফল খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী করে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে, মনোবাসনা পূর্ণ হবে? কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—মা ফলেষু কদাচন—কর্ম করো, ফল চেয়ো না। কৃপণাঃ ফলহেতবঃ—যারা ফল চায় তারা হীন ব্যক্তি। আমরা এত স্বার্থপর যে ভালবেসে প্রতিদান চাই। ভগবানকে বা প্রিয়জনকে ভালবাসলে আমি কী পাব? এই দেনাপাওনার ভালবাসা নিকৃষ্ট ভালবাসা।

রবীন্দ্রনাথ 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছেন : ''বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালো লাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।''

আমরা যাকে ভালবাসি তাকে দিনরাত চিন্তা করি, তাকে আমাদের দেহ, মন যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিতে ইচ্ছা করি, সদা তার মঙ্গল প্রার্থনা করি। পারিবারিক জীবনে ভালবাসা এবং পরস্পরের মঙ্গলচিন্তায় আসে সুখ-শান্তি। আর অধ্যাত্মজীবনে ভগবানকে ভালবাসলে আসে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি।

ধ্যানের দ্বারা আমরা কী পাব? নিত্য নিয়মিত ধ্যান করলে নিজের মঙ্গল হয় এবং দশের ও দেশেরও মঙ্গল হয়। ভট্টিকাব্যে দশরথ বিশ্বামিত্র ঋষিকে বলেছেন : ''হে মুনিবর, পুনর্জন্ম নিবারণের জন্য যে-ধ্যান আপনি অবলম্বন করেছেন, আপনার যে-ধ্যান রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এই পাঁচটি বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, যে-ধ্যানের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সাধন করতে পেরেছেন—আপনার সেই ধ্যানের মঙ্গল তো?'' ভগবান মঙ্গলময়। তাঁর ধ্যান

করলে মঙ্গলই হয়—অমঙ্গল হয় না, এ-জগতে মূর্খ ব্যক্তিও নিজের অমঙ্গল চায় না।

প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানের ব্যাপারে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। পতঞ্জলি বলেছেন—'যথাভিমতধ্যানাদ্ বা' অর্থাৎ অভীষ্ট বা যে-রূপে অভিরুচি ধ্যান করলে চিত্ত স্থির হয়। কী সুন্দর উপদেশ! সংকোচ নেই, অনুদারতার লেশ নেই। ঋষি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন এই জেনে যে আমরা অধ্যাত্মপিপাসু কিন্তু কেউ যদি উপাস্য দেবতা ছেড়ে কামিনীকাঞ্চনের উপর ধ্যান করে তবে তার ফল হবে মারাত্মক।

অনেকে ধারণা (concentration) ও ধ্যান (meditation)-কে সমার্থক মনে করে। কিন্তু এই দুটির মধ্যে তারতম্য আছে। যেমন একটা মৌমাছি ফুলের উপর দ্রুত পাখা নেড়ে গুনগুন করছে—এটিই হল concentration। আর ওই মৌমাছি যখন পাখা নাড়া বন্ধ করে এবং গুনগুন শব্দ থামিয়ে তন্ময় হয়ে ফুলের মধু চুষতে শুরু করে, তাই হল meditation-এর দৃষ্টান্ত। ধ্যানকালে সাধক ইষ্টের ধ্যানে তন্ময় হয়ে আনন্দসাগরে ডুবে যান। গরুড়পুরাণে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সময় নির্দেশ করা হয়েছে : ''প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যা কালঃ কৃতো ভবেৎ।/ স তাবৎকালপর্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ॥''—দ্বাদশবার প্রাণায়াম করতে যত কালের আবশ্যক, তত কাল ধারণা করবে। ওই ধারণাকালের দ্বাদশগুণ পরিমিত কালে ধ্যান, ও ধ্যানের দ্বাদশগুণ পরিমিত কালে সমাধি বুঝতে হবে। দীর্ঘকাল ও নিরন্তর মনকে ইষ্টে নিবিষ্ট করাই ধ্যান।

গুরুপ্রদর্শিত পথে ধ্যানজপ করা উচিত। তারপর যদি সময় থাকে সাধনজগতে adventure করতে কোনও বাধা নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি মা জগদম্বার কাছ থেকে ভাবমুখে থাকার নির্দেশ পেয়েছিলেন। ধর্মজীবনে adventure সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন : ''সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি বাস করে, তাহার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কতপ্রকারের রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়াও, মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে নানারূপে দেখিব।''

আমরা ঠাকুরের ছবি সামনে রেখে জপধ্যান করি আর ভাবি আমাদের কি সারাজীবন ছবি দেখাই সার হবে? মন অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে। তারপর আসে হতাশা ও একঘেয়েমি, অবসাদ ও বিরক্তি। অনেকে তখন ধ্যানজপ বন্ধ করে দেয়। এই সময়ে দরকার ধৈর্য, সাধুসঙ্গ, সদ্গ্রন্থপাঠ, তীর্থভ্রমণ এবং সর্বোপরি গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

একজন সাধু তপস্যা করতে গিয়ে মনের চঞ্চলতা ও অবসাদে ভুগছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে লেখেন (১১।৭।১৫) : '' 'সঙ্গী জোটে না জোটে একাই কর মেলা'—স্বামীজীর এই পুরানো কথা ছাড়িও না। আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুর বলিতেন, 'আমি আছি আর আমার মা আছেন।' বস্ আর কাহাকে চাই? পড়িয়া থাকাই হইতেছে কাজ। পড়িয়া থাকিতে পারিলে ক্রমে সব সুবিধা হইয়া যায়। ঠাকুরকে লইয়া পড়িয়া থাক—দেখিবে পরে কি হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'সোলার আতা দেখলে আসল আতা মনে হয়।' তেমনি তাঁহার ফটো তাঁহাকেই মনে করাইবে। তাঁহাকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও—দেখিবে সত্য সত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে।... বৃথা ঘোরাঘুরি করিয়া কি করিবে? দিন চলিয়া যাইতেছে—আর ফিরিবে না।... তুমি স্থির হইয়া বসিয়া থাক আপনার ঠাকুরকে লইয়া। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি।''

এই প্রাণমন মজাইয়া ফেলিবার জন্য অচল ধ্যান ও সচল ধ্যান সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন।

অচল ধ্যান হল : ভক্তের সামনে ঠাকুরের ছবি। ওই মূর্তিতে ভক্ত ঠাকুরের পা, হাঁটু, হাত, বক্ষ, মুখ, চোখ, কান, মাথা ও সমগ্র শরীর দেখছে বা ওই মূর্তি ভক্ত চোখ বন্ধ করে হৃৎপদ্মে দেখছে।

সচল ধ্যান হল : আমরা মানসপটে দেখছি ঠাকুর মন্দিরে মা কালীকে পূজা করছেন, গান গেয়ে শোনাচ্ছেন, 'মা খাও' বলে নৈবেদ্য নিবেদন করছেন, দীর্ঘসময় ধরে আরতি করছেন। ঠাকুরের প্রতিটি action এভাবে visualise করাও ধ্যান। আমরা ঠাকুরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যত্র নানারকম ধ্যানের বিষয় সৃষ্টি করতে পারি। যেমন, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কৃষ্ণমন্দিরে ভাগবত শুনছেন। একটা জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি থেকে এসে তাঁকে স্পর্শ করল এবং তারপর ভাগবত স্পর্শ করল। তাঁর অনুভূতি হল—ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান এক। আমরা দেখি ঠাকুর শিবমন্দিরে শিবের মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। ঠাকুরের ঘরের পশ্চিমে গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গাদর্শন করছেন। পঞ্চবটীতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এসব সচল ধ্যানের উদাহরণ—যা কথামৃতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।

সৃজনশীল মন নিয়ে আমরা এভাবেও ধ্যান করতে পারি : ঠাকুর তাঁর ঘরে ছোট খাটটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ভক্ত মেঝেতে বসে ঠাকুরের দু-হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে এবং দুহাতে ঠাকুরের দুই পা বক্ষে ধারণ করে এই গানটি আবৃত্তি করছেন : ''নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার।/ নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥/ তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধিবল/ তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥/ তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম/ তুমি শাস্ত্রবিধি গুরুকল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার॥/ তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টাপাতা, তুমি হে উপাস্য/ দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥''

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তের প্রতি)—আহা কি গান! ''তুমি সর্বস্ব আমার!''

এই বলে ঠাকুর ভক্তের মাথায় দুহাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। এটিও সচল ধ্যানের দৃষ্টান্ত।

ভাগবতে আছে, ''কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'' (৭।১।৩১)—যে-কোনও উপায়েই হোক, কৃষ্ণে মন নিবেশিত বা যুক্ত করবে। ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন আমরা কীভাবে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এই মিলনেই শান্তি, বিচ্ছেদে অশান্তি। এক ভক্ত গুরুর কাছে গিয়ে বললেন, ''মহারাজ, মনে বড় অশান্তি।'' গুরু বললেন, ''আমি বলে দিতে পারি কী ভাবে অশান্তি যায়।'' ''কী ভাবে?'' ''বাসনা ত্যাগ করো।'' ''আমরা সংসারী মানুষ। বাসনা ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়।'' তখন গুরু বললেন, ''তাহলে অশান্তি নিয়েই থাকো।'' ব্রহ্মচিন্তা বা ইষ্টের উপর ধ্যান করলে অন্তর শীতল হয়; আর অন্তর শীতল হলে সমস্ত জগৎ শীতল বলে মনে হয়। এই শরীরে তাঁকে লাভ করতে পারলে মঙ্গল, নতুবা মহতী বিনষ্টি, অর্থাৎ ক্রমাগত জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে হবে।

ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ধ্যানের উপদেশ দেওয়ার কালে 'ধ্যানমঙ্গলম্' শব্দ উল্লেখ করেছেন (১১।১৪।৩৭)। শ্রীধরস্বামী তার ব্যাখ্যা করেছেন, 'ধ্যানস্য শুভং বিষয়ম্' অর্থাৎ যে-বিষয়ে ধ্যান করলে মানুষের শুভ, কল্যাণ, হিত, অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স ও ইষ্টলাভ হয়। ভাবভক্তিতে ডুবে থাকার জন্য জ্ঞানী উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর নিখুঁতভাবে ধ্যানের উপদেশ দিয়েছেন।

আজকাল ধ্যানের বিশুদ্ধতা ও গভীরতা খুব কম মানুষই বোঝে। চঞ্চল মনকে শান্ত করার নানাবিধ ধ্যানের টেকনিক আমেরিকায় বিক্রি হয়। আমাদের

শাস্ত্রেও ধ্যানের বিভিন্ন প্রণালীর নির্দেশ আছে। মন পবিত্র না হলে ঈশ্বরের ধ্যান হয় না। সেজন্য চাই প্রস্তুতি—সংযম। এ-পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিষয়ের উপর ধ্যান করে। যেমন তামসিক ব্যক্তি শত্রুর উপর ধ্যান করে; তখন হু হু করে সময় কেটে যায়। রাজসিক ব্যক্তি কামিনীকাঞ্চনের উপর ধ্যান করে। আর সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঈশ্বরের ধ্যান করে।

উদ্ধব ধ্যানের উপদেশ চাইলে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের ১১।১৪।৩২-৪৬ শ্লোকে বিশদভাবে ধ্যানের প্রণালী বলেছেন। এখানে সেটি সংক্ষেপে বর্ণিত হল :

সর্বাঙ্গে মন ধারণা—'সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্বাঙ্গেষু মনো দধৎ'—প্রথমে সর্বাঙ্গে মন ধারণ করে সুকুমার মূর্তি ধ্যান করবে। প্রথমে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করাই বিধি।

মাত্র মুখে ধারণা—''তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তম্ আকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।/ নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥''—সেই সর্বব্যাপক চিত্তকে কুড়িয়ে এক জায়গায় ধারণা করবে। আর অন্য চিন্তা করবে না, কেবল সহাস্য মুখ চিন্তা করবে।

আকাশে ধারণা—'তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ'—মুখে লগ্ন চিত্তকে আকর্ষণ করে আকাশে ধারণা করবে।

কিছুই চিন্তা করবে না—'তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—আকাশও ত্যাগ করে কিছুই চিন্তা করবে না। মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মে অবস্থিত থাকবে। জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হবে। এই ধ্যান অভ্যাস করলে মনের ত্রিপুটি—ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান বা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—এই বিভাগ লয় হয়ে মন নির্বাণ বা শান্তি প্রাপ্ত হয়।

অনেকে mechanically জপ করে, কিন্তু জপের অর্থ ভাবনা করে না—ফলে আনন্দ পায় না। পতঞ্জলি পরিষ্কার বলেছেন—তজ্জপস্তদর্থভাবনম্—জপ ও তার অর্থ ধ্যান করাই উপাসনা। নামের সঙ্গে নামীর চিন্তা হলে মন স্থির হয়, রসবোধ হয়।

নামীর চিন্তা নামজপের সঙ্গে যুগপৎ কীভাবে হতে পারে? ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন : ''ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে কাজকর্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়; হয়তো কাজকর্মও করে, কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে, সেইরূপ।'' এই প্রসঙ্গে ঠাকুর নষ্ট স্ত্রী ও দাঁতের যন্ত্রণারও উদাহরণ দিয়েছেন।

জপকালে নামীর ধ্যান এভাবেও হতে পারে : যেমন এক রামভক্ত রামনাম জপ করছেন। জপকালে তিনি দেখছেন তাঁর ইষ্ট রাম অযোধ্যায় রাজা হবেন বলে খুব উৎসব চলছে। তখন ভক্তের কী আনন্দ! তারপরেই দেখছেন রামলক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে যাচ্ছেন, তখন ভক্তের মনে দুঃখ হল। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণকালে তাঁর রাগ হল, আবার রাবণবধে আনন্দ হল। তারপর রাম রাজা হলে ভক্তের খুব আনন্দ হল। এভাবে জপকালে মনটা রামময় হতে পারে।

জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা—এই তিনটি একসঙ্গে কী করে করা যায়? ধরা যাক, কোন ভক্ত 'রামকৃষ্ণ' নাম জপ করে। প্রথম সে মনে মনে কামারপুকুরে গিয়ে ঠাকুরের মূর্তির সামনে বসে তার ইষ্টমন্ত্র একশো বার জপ করল এবং প্রতি জপের সঙ্গে ''ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ দূর করো'' বলে প্রার্থনা করল। এতে মন্ত্র জপ, মূর্তির ধ্যান ও প্রার্থনা একসঙ্গে হল। এই মন্ত্র সাধনায় জপের mechanical ভাবটা কেটে গিয়ে অনুরাগ বাড়বে এবং প্রার্থনার দ্বারা ইষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে।

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কথোপকথনই প্রার্থনা। হাজরা বলেছিলেন ঠাকুরকে, ''ভগবান

কি আমাদের প্রার্থনা শোনেন?" উত্তরে ঠাকুর বলেন, "এক-শো-বার! যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়!"

আমাদের মন চঞ্চল—এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা প্রতিক্ষণ তা অনুভব করছি। মানুষ সিনেমা দেখতে ভালবাসে কারণ সিনেমার film অনবরত সরে সরে ছবি পর্দার উপর ফেলছে। ওইজন্য মন ও সিনেমার ভিতর বন্ধুত্ব আছে—কারণ উভয়েই চঞ্চল। আমরা আমাদের চঞ্চল মনকে দশ জায়গায় ঘোরাতে পারি। It is a kind of spiritual adventure—সাধনসংকেত মাত্র।

কামারপুকুরের পর আমরা জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তির সামনে বসে আমাদের সেই একই ইষ্টমন্ত্র একশো বার জপ করব এবং প্রতি জপের সঙ্গে প্রার্থনা করব, "মা, তুমি আমার ভোগবাসনা দূর করো।" দশের পরিবর্তে একশো বার জপ করলে সেইস্থানে একটু অধিক সময় অবস্থান হবে যাতে আমরা ধীরে সুস্থে ওই মূর্তির ধ্যান করতে পারি। ঠাকুর ও মা আলাদা নন; তাছাড়া ঠাকুর হলেন সর্বদেবদেবীস্বরূপ।

আমাদের জপ-ধ্যান-প্রার্থনা সাধনার তৃতীয় স্থান উদ্বোধন বাড়িতে মায়ের ঘর। প্রতিস্থানে আমাদের জপের সংখ্যা ও ধ্যানের বিষয় একই থাকবে, কেবল প্রার্থনা পাল্টাবে। যেমন, এখানে বলব, "মা, আমার মোহ দূর করো।

চতুর্থ স্থান : দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মা কালীর মন্দির। সেখানে প্রার্থনা করব : "মা, আমার অহংকার দূর করো।"

পঞ্চম স্থান : দক্ষিণেশ্বরের কৃষ্ণ মন্দির। সেখানে প্রার্থনা করব : "হে কৃষ্ণ, আমাকে শুদ্ধ করো, পবিত্র করো।"

ষষ্ঠ স্থান : দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিব মন্দির। এগুলির উত্তর দিকের কোণের শিবমূর্তির সামনে প্রার্থনা করব : "হে দেবাদিদেব মহাদেব, আমার সেবা গ্রহণ করো।"

সপ্তম স্থান : দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর। মনশ্চক্ষে আমরা দেখব ঠাকুর খাটের উপর পূর্ব দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, "ঠাকুর, তুমি আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

অষ্টম স্থান : দক্ষিণেশ্বরে নহবত। মায়ের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করব, "মা, কৃপা করে দর্শন দাও।"

নবম স্থান : কাশীপুরে ঠাকুরের ঘর। ঠাকুরের ছবির সামনে প্রার্থনা করব, "ঠাকুর, তোমায় যেন না ভুলি।"

দশম স্থান : বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির। সেখানে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রার্থনা করব, "ঠাকুর, আমি শরণাগত-শরণাগত-শরণাগত।"

এভাবে এক হাজার জপের পর আমরা বাকি আট জপের সমাপ্তি করব বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরে। মা সারদা স্বয়ং জ্ঞানদা, শুভদা, বরদা, শান্তিদা। তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করব : "মা, তুমি সর্বমঙ্গলা। তুমি আমাকে কৃপা করো। আমার মঙ্গল করো। দেশের ও দশের মঙ্গল করো, জীবজগতের মঙ্গল করো।"

ভগবানের রূপের ও গুণের যেমন শেষ নেই, তাঁর ধ্যানেরও শেষ নেই। তাই আমাদের গুরু দীক্ষাকালে বলে দেন : হৃৎপদ্মে ইষ্টের ধ্যান করবে। আর আমাদের শাস্ত্রও এভাবে ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছেন : "নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।/ যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥"—মঙ্গলময় ভগবান হরি যাঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নিত্য উৎসব, নিত্য ঐশ্বর্য এবং নিত্য মঙ্গল হয়ে থাকে।